পর্দা জাতীয় উন্নতির পথে বাধা নয়

الحجاب ليس عائقاً في سبيل تقدم الوطن وازدهاره

চৌধুরী আবুল কালাম আজাদ

أبو الكلام أزاد

ℵℑ

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

পর্দা জাতীয় উন্নতির পথে বাধা নয়

পর্দার বিধান

পর্দা কি আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রগতির অন্তরায়? এ প্রশ্নের মীমাংসার পূর্বে একটি কথা উত্তমরূপে জেনে নেওয়া আবশ্যক যে, প্রকৃতরূপে পর্দা কাকে বলে? কেননা এতদ্ব্যতীত আমরা পর্দার উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা এবং তার উপকারিতা অপকারিতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব না। অতঃপর আমাদেরকে এ-ও সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমরা মূলত কোন ধরনের প্রগতি অর্জন করতে চাই? কারণ এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে পর্দা তার অন্তরায় কি না তা যথার্থরূপে অনুধাবন করা সম্ভব হবে না।

পর্দা আরবী 'হিজাব' শব্দের বাংলা ও উর্দূ তরজমা। কুরআন মাজীদের যে আয়াতে মুসলিমদের আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে নিঃসংকোচে ও বেপরোয়াভাবে যাতায়াত করতে নিষেধ করেছেন, তাতে এ 'হিজাব' শব্দই উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, যদি ঘরের স্ত্রীলোকদের নিকট থেকে তোমাদের কোনো জিনিস নেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে তা হিজাবের আড়াল থেকে চেয়ো।

কুরআনের এ নির্দেশ থেকেই ইসলামী সমাজে পর্দার সূচনা হয়। অতঃপর এ প্রসঙ্গে আর যত আয়াতই নাযিল হয়েছে, তার সমষ্টিকে আহকামে 'হিজাব' বা পর্দার বিধান বলা হয়েছে। সূরা আন-নূর ও সূরা আল-আহযাবে এ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এ সব আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহিলারা যেন তাদের মর্যাদা সহকারে আপন ঘরেই বসবাস করে এবং জাহেলী যুগের মেয়েদের মতো বাইরে নিজেদের রূপ সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে না বেড়ায়। তাদের যদি ঘরের বাইরে যাবার প্রয়োজন হয়, তবে আগেই যেন চাদর (কাপড়) দ্বারা তারা নিজেদের দেহকে আবৃত করে নেয় এবং ঝংকারদায়ক অলংকারাদি পরিধান করে ঘরের বাইরে না যায়। ঘরের ভেতরেও যেন তারা মাহরাম (যার সংগে বিয়ে নিষিদ্ধ) পুরুষ ও গায়রে মাহরাম পুরুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং ঘরের ছোট বয়সের কিংবা মেয়েদের ব্যতীত অন্য কারো সামনে যেন জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরে না বেরোয়।

অতঃপর মাহরাম পুরুষদের সামনে বের হওয়া সম্পর্কেও এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, তারা বেরোবার পূর্বে যেন কাপড়ের আঁচল দ্বারা তাদের মাথাকে আবৃত করে নেয় এবং নিজেদের সতর লুকিয়ে রাখে। অনুরূপভাবে পুরুষদেরকেও তাদের মা- বোনদের নিকট যাবার পূর্বে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন অসতর্ক মুহূর্তে মা-বোনদের দেহের গোপনীয় অংশের প্রতি তাদের দৃষ্টি পড়তে না পারে।

কুরআন মজীদে উল্লিখিত এ সমস্ত নির্দেশকেই আমরা পর্দা বলে অভিহিত করে থাকি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দার ব্যাখ্যা করেছেন, যা থেকে বুঝা যায় যে, মহিলাদের সতর হচ্ছে মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও পায়ের পাতা ব্যতীত দেহের অবশিষ্টাংশ। এ সতরকে মাহরাম পুরুষ এমন কি পিতা, ভাই প্রভৃতির সামনেও ঢেকে রাখতে হবে। মেয়েরা এমন কোনো মিহি কাপড় পরিধান করতে পারবে না যাতে তাদের দেহের গোপনীয় অংশ বাইরে থেকে দৃষ্টিগোচর হতে পারে। তাছাড়া তাদেরকে মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্য কারো সাথে ওঠা বসা কিংবা ভ্রমণ করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন।

কেবল তাই নয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে সুগন্ধি মেখেও ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন। এমনকি তিনি মসজিদে জামায়াতের সাথে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য পৃথক স্থান পর্যন্ত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। নারী ও পুরুষকে মিলিতভাবে একই কামরায় বা একই স্থানে সালাত আদায়ের তিনি

কখনো অনুমতি প্রদান করেন নি। এমন কি সালাত শেষে খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সহাবীগণ মহিলাদেরকে মসজিদ থেকে আগে বের হওয়ার সুযোগ দিতেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মসজিদ থেকে সম্পূর্ণরূপে বের না হতেন ততক্ষণ পুরুষরা তাঁদের কামরার ভেতরেই অপেক্ষা করতেন।

পর্দার এই সমস্ত বিধান সম্পর্কে যদি কারো মনে সংশয় থাকে, তা'হলে তিনি কুরআনের সূরা আন-নূর ও সূরা আল-আহযাব এবং হাদীসের বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করে দেখতে পারেন। বর্তমান সময়ে আমরা যাকে পর্দা বলে অভিহিত করে থাকি, তার বাহ্যিক রূপে কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বটে, কিন্তু মূলনীতি ও অন্তর্নিহিত ভাবধারার দিক দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মদীনার ইসলামী সমাজে প্রবর্তিত পর্দা ব্যবস্থারই অনুরূপ রয়ে গেছে। অবশ্য আল্লাহ ও রাসূলের নামে আপনাদের মুখ বন্ধ করা আমার অভিপ্রায় নয়; কিন্তু এ কথা আমি নিতান্ত সততার খাতিরেই বলতে বাধ্য যে, অধুনা আমাদের মধ্যে 'পর্দা প্রগতির অন্তরায়' বলে যে ধূয়া উঠেছে, তা আমাদের দু'মুখো ও মুনাফেকী মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। কেননা এ ধরনের শ্লোগান আল্লাহ তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনেরই নামান্তর। এর পরিস্কার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ এবং রাসূল পর্দার ব্যবস্থা করে আমাদের উন্নতি ও প্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)।

বস্তুত পর্দা সম্পর্কে আমাদের মনে যদি এ বিশ্বাসই বদ্ধমূল হয়ে থাকে, তাহলে নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দেওয়ারই বা আমাদের কি অধিকার আছে? আর যে আল্লাহ এবং রাসূল আমাদের ওপর এমনি একটি 'নিপীড়নমূলক' ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেই বা আমরা অনাস্থা জ্ঞাপন করি না কেন? বস্তুত এসব প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে এ কথা কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে, আল্লাহ এবং রাসূল মূলতই পর্দার কোনো নির্দেশ দেন নি। কারণ, একটু পূর্বেই আমি কুরআন ও হাদীস থেকে উদ্ধৃতি পেশ করে অকাট্যরূপে প্রমাণ করেছি এটা কোনো মনগড়া জিনিস নয়- বরং এটা আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলেরই প্রদত্ত বিধান ।

এ বিষয়ে আরো বিস্তারিতরূপে কারো জানার আগ্রহ থাকলে তিনি কুরআন-হাদীস থেকেই সরাসরি জ্ঞান লাভ করতে পারেন। আর হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে যদি কেউ পর্দার বিধান সম্পর্কে সংশয় পোষণ করতে চান, তাহলে তিনি কুরআন মাজীদ থেকেই তার সংশয় নিরসন করতে পারেন। কুরআনে এ সম্পর্কে এত সুস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাকে কূটতর্কের বেড়াজাল দিয়ে কোনো প্রকারেই আড়াল করে রাখা সম্ভব নয়।

পর্দার উদ্দেশ্য

ইসলামে যে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে, তৎসম্পর্কে একটু তলিয়ে চিন্তা করলে আমরা তার তিনটি উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারিঃ

প্রথমত: নারী ও পুরুষের নৈতিক চরিত্রের হিফাযত করা এবং নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে সমাজে যেসব ত্রুটি বিচ্যুতির উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সে সবের প্রতিরোধ করা।

দ্বিতীয়ত: নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রকে পৃথক করা, যেন নারীর ওপর যে গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে, তা সে নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে।

তৃতীয়ত: পারিবারিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় করা। কারণ, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আর যত ব্যবস্থাই রয়েছে তার মধ্যে পারিবারিক ব্যবস্থা শুধু অন্যতমই নয়; বরং এ হচ্ছে গোটা জীবন ব্যবস্থার মূল বুনিয়াদ। তাই যে দেশে বা যে সমাজে পর্দাকে বিসর্জন দিয়ে পারিবারিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করার প্রচেষ্টা চলেছে, সেখানে মেয়েদেরকে শুধু পুরুষদের দাসী ও পদসেবিকাই বানানো হয়েছে এবং তাদেরকে সমস্ত ন্যায্য অধিকার প্রদানের নামে পর্দার বাঁধন থেকে আযাদ করে দেয়া হয়েছে। সেখানে পারিবারিক ব্যবস্থায় দেখা দিয়েছে গুরুতর বিশৃংখলা। ইসলাম নারীকে তার ন্যায্য অধিকার প্রদানের সংগে সংগে পারিবারিক ব্যবস্থাকেও সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করেছে। কাজেই যে পর্যন্ত

নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্যে পর্দার ব্যবস্থা না থাকবে, সে পর্যন্ত ইসলামের উদ্দেশ্য মোটেই সফল হতে পারে না।

আমি আমার মা-বোনদেরকে ইসলামের উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে শান্ত মস্তিষ্কে ধীর স্থীরভাবে চিন্তা করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। অবশ্য যদি কেউ নৈতিক চরিত্রের প্রশ্নটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে না করেন, তবে তার সে ব্যাধির কোনো প্রতিষেধক আমার কাছে নেই। কিন্তু যিনি নৈতিকতাকে জীবনের অমূল্য সম্পদ বলে মনে করেন, তাঁর একথা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা উচিত যে, যে সমাজে মেয়েরা চোখ ঝলসানো পোশাক পরিচ্ছেদ ও অলংকারাদিতে সুসজ্জিতা হয়ে প্রকাশ্যে নিজেদের রূপ যৌবনের প্রদর্শনী করে বেড়ায় এবং সর্বত্র পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা করার সুযোগ পায়, সেখানে তাদের চারিত্রিক মেরুদন্ড ধ্বংসের কবল থেকে কিরূপে রক্ষা করা যেতে পারে? আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের দেশে নারী-পুরুষের মধ্যে যারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ে থাকেন, তারা অনায়াসেই আমার এ উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। সুতরাং এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

কেউ কেউ বলে থাকেন, আমাদের সমাজ জীবনে যেসব অনাচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তার মূলে নাকি রয়েছে পর্দাপ্রথা এবং পর্দার ব্যবস্থা না থাকলে মেয়েদের সম্পর্কে পুরুষদের নাকি মনে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হত। যারা এরূপ ধারণা পোষণ করেন, তারা যে নিতান্তই ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছেন, তা আমি দৃঢ়তার সাথেই বলতে চাই। কারণ, যে সমাজে পর্দাকে বিসর্জন দিয়ে নারীকে সম্পূর্ণ 'আযাদ' করে দেয়া হয়েছে, সেখানে পুরুষের মনে সম্ভ্রমবোধ জাগা তো দূরের কথা, বরং নারীর মহান মর্যাদাকেই সেখানে নগ্নতা ও উলংগতার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছানো হয়েছে। এমনকি, তাতেও যেখানে মানুষের যৌন লালসা নিবৃত্ত হয় নি, সেখানে প্রকাশ্য ব্যভিচারকেই উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজের বিভিন্ন স্তরে কিরূপ ভাঙন ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে, তা আপনারা বৃটেন, আমেরিকা এবং তাদের অনুসারী তথাকথিত প্রগতিশীল দেশগুলোর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকেই সম্যক অনুধাবন করতে পারেন। আমার মা-বোনদের নিকট জিজ্ঞাস্য যে, পর্দাকে বিসর্জন দিয়ে এহেন প্রগতিই কি তারা কামনা করেন?

বস্তুত এটা শুধু নৈতিক প্রশ্নই নয়; বরং এর সংগে আমাদের গোটা তাহযীব-তামাদ্দুন জড়িত রয়েছে। অধুনা দেশে নারী-পুরুষের মিলিত আচার অনুষ্ঠানের মাত্রা যত বেড়ে চলেছে, মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রসাধনী দ্রব্যের ব্যয় বাহুল্য ততই উর্ধমূখী হচ্ছে। এর ফলে একদিকে হালাল উপায়ে অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে, অপরদিকে সুদ, ঘুষ আত্মসাৎ, চোরাকারবারী প্রভৃতি সমাজ বিধ্বংসী পাপাচারেরও ব্যাপক প্রচলন হচ্ছে।

বলাবাহুল্য এ সমস্ত হারামখুরীর অভিশাপেই আজ আমাদের সামাজিক কাঠামো ঘুণে ধরা কাঠের ন্যায় দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং এর ফলে আজ দেশে আইনের শাসনও সঠিকভাবে চালানো সম্ভব হচ্ছে না। আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, যারা নিজেদের ব্যক্তিগত লালসা বাসনার ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম শৃংখলা মেনে চলতে অভ্যস্ত নয়, সামাজিক ব্যাপারে তারা কিরূপে নিয়ম-শৃংখলার অনুবর্তী হয়ে চলবে? আর যে ব্যক্তি নিজের পারিবারিক জীবনেই কোনো বিধি-বিধানের অনুবর্তী হতে পারে না, রাষ্ট্রীয় জীবনে তার কাছ থেকে আইনের আনুগত্যের আশা করাটা নিতান্তই বাতুলতা নয় কি?

নারী ও পুরুষের কর্মবন্টন

বস্তুত নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রকে খোদ স্রষ্টাই স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন। স্রষ্টা মাতৃত্বের পবিত্র দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে নারীর উপর সোপর্দ করেছে এবং সেই সংগে দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত স্থান কোথায়, তাও বাতলিয়ে দিয়েছে। অনুরূপভাবে পিতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে পুরুষের ওপর এবং সেই সংগে মাতৃত্বের মতো গুরুদায়িত্বের বিনিময়ে তাকে আর যেসব কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাও সুস্পষ্টরূপে নির্ধারণ করে দিয়েছে। উপরন্তু এ

উভয় প্রকার দায়িত্ব পালনের জন্য নারী ও পুরুষের দৈহিক গঠন, শক্তি সামর্থ ও ঝোঁক প্রবণতায়ও বিশেষ পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যাকে আল্লাহ মাতৃত্বের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে ধৈর্য, মায়া মমতা, স্নেহ ভালোবাসা প্রভৃতি কতকগুলো বিশেষ ধরনের গুণে গুণান্বিত করেছেন। নারীর ভেতরে এসব গুণের সমন্বয় না হলে তার পক্ষে মানব শিশুর লালন পালন করা সম্ভবপর হত কি? বস্তুত মাতৃত্বের মহান দায়িত্ব যার উপর অর্পণ করা হয়েছে; তার পক্ষে এমন কোনো কাজ করা সম্ভব নয়, যার জন্যে রুক্ষতা ও কঠোরতার প্রয়োজন। এ কাজ শুধু তার দ্বারাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে, যাকে এর উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে পিতৃত্বের মতো কঠোর দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

আজকে যারা সমান অধিকারের নামে নারী ও পুরুষের এই প্রকৃতিগত পার্থক্যকে মিটিয়ে দিতে চান, তাদেরকে আমি অনুরোধ করবো, আপনারা এ পথে কোনো পদক্ষেপ নেয়ার আগে মনে করে নিন যে, এ যুগে পৃথিবীর আদতেই মাতৃত্বের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে চাই যে, আপনারা যদি এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে আনবিক বোমার প্রয়োগ ছাড়াই অল্প দিনের মধ্যেই মানবতার চূড়ান্ত সমাধি রচিত হবে। পক্ষান্তরে আপনারা যদি এরূপ সিদ্ধান্ত করতে না পারেন এবং নারীকে তার মাতৃসুলভ দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে পরুষের মতো রাজনীতি, ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্পকার্য, যুদ্ধ পরিচালনা ইত্যাদি ব্যাপারেও অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করেন, তাহলে তার প্রতি নিঃসন্দেহে চরম অবিচার করা হবে।

আমি আপনাদেরকে ন্যায়-নীতির খাতিরে একটু ধীর স্থীরভাবে চিন্তা করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। নারীর ওপর স্রষ্টা যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে, তা নিঃসন্দেহে মানবতার অর্ধেক সেবা এবং এ সেবাকার্য সে সাফল্যের সঙ্গেই সাধন করে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে পুরুষের নিকট থেকে সে বিন্দুমাত্রও সহযোগিতা পচ্ছে না, অথচ অবশিষ্ট অর্ধেকের অর্ধেক দায়িত্বও আবার আপনারা নারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এর ফল এ দাঁড়াবে যে, নারীকে পালন করতে হবে মোট দায়িত্বের তিন চতুর্থাংশ এবং পুরুষের ওপর বর্তাবে মাত্র এক-চতুর্থাংশ। আমি আপনাদেরকে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করতে চাই নারীর প্রতি এ কি আপনাদের সুবিচার? অবশ্য মেয়েরা এ যুলুম অবিচারকে মেনে নিচ্ছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ যুলুমের বোঝাকে স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেওয়ার জন্য লড়াই করছে। তার মূল কারণ হচ্ছে এ যে, তারা পুরুষদের কাছে যথার্থ সমাদর পাচ্ছে না। ঘর সংসার ও মাতৃত্বের মতো কঠিন দায়িত্ব সঠিকরূপে পালন করা সত্ত্বেও আজ তারা সমাজে উপেক্ষিত, অপাংক্তেয়। সন্তানবতী ও গৃহিনী মেয়েদেরকে আপনারা ঘৃণা করেন এবং স্বামী ও সন্তান-সন্ততির এত সেবা -যত্ন করা সত্ত্বেও আপনারা তাদের যথার্থ কদর করছেন না। অথচ এই সমস্ত কার্যে তাদের যে বিপুল ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তা পুরুষদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও যুদ্ধ বিগ্রহ সংক্রান্ত দায়িত্বের চাইতে কোনো অংশেই কম নয়। বস্তুত এসব কারণেই মেয়েরা আজ অনন্যোপায় হয়ে দ্বিগুণ দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হচ্ছে। তারা পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে যে, পুরুষ-সুলভ কার্যে অগ্রসর না হলে সমাজে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা নেই।

নারী ও প্রগতি

ইসলাম মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করার দরুন নারীকে শুধু পুরুষের সমান মর্যাদা দেয় নি; বরং কোনো কোনো পুরুষের চাইতেও বেশী মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু এটাকে আপনারা প্রগতির অন্তরায় বলে উপেক্ষা করছেন। আপনাদের দাবী হচ্ছে, নারী মাতৃত্বের গুরুদায়িত্ব পালন করবে, ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে জেলার শাসনকার্যও পরিচালনা করবে এবং নর্তকী ও গায়িকা হয়েও আপনাদের চিত্তবিনোদনও করবে। কী অদ্ভুত আপনাদের খেয়াল!

বস্তুত আপনারা নারীর ওপর দায়িত্বের এরূপ দুরূহ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন, যার ফলে সে কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে পারছে না। আপনারা তাকে এমন সব কাজে নিযুক্ত করছেন, যা জন্মগতভাবেই তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। শুধু তাই নয়, আপনারা তাকে তার সুখের নীড় থেকে টেনে এনে প্রতিযোগিতার ময়দানে দাঁড় করাচ্ছেন, যেখানে

পুরুষের মুকাবিলা করা তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এর স্বাভাবিক পরিণতি এই দাড়াবে যে, প্রতিযোগিতামূলক কাজে সে পুরুষের পেছনে পড়ে থাকতে বাধ্য হবে। আর যদি কিছু করতে সক্ষম হয় তবে তা নারীত্বের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দিয়েই করতে হবে।

তথাপি এটাকেই আপনারা প্রগতি বলে মনে করেন আর এ তথাকথিত প্রগতির মোহেই আপনারা ঘর সংসার ও পারিবারিক জীবনের মহান কর্তব্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছেন। অথচ এ ঘর-সংসারই হচ্ছে মানব তৈরির একমাত্র কারখানা। এ কারখানার সাথে জুতা কিংবা পিস্তল তৈরির কারখানার কোনো তুলনাই চলে না। কারণ, এ কারখানা পরিচালনার জন্য যে বিশেষ ধরনের গুণাবলি, ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা আবশ্যক, স্রষ্টা তার বেশীর ভাগ শক্তিই দিয়েছেন নারীর ভেতরে। এ কারখানার পরিসর বিস্তৃত-কাজও অনেক। যদি কেউ পরিপূর্ণ দায়িত্বানুভূতি সহাকারে এ কারখানার কাজে আত্মনিয়োগ করে, তার পক্ষে বাইরের দুনিয়ায় নজর দেওয়ার আদৌ অবকাশ থাকে না; বস্তুত এ কারখানাকে যতখানি দক্ষতা ও নৈপূন্যের সাথে পরিচালনা করা হবে, ততখানি উন্নত ধরনের মানুষই তা থেকে বেরিয়ে আসবে। কাজেই এ কারখানা পরিচালনার উপযোগী শিক্ষা ও ট্রেনিংই নারীর সবচাইতে বেশি প্রয়োজন। এ জন্যেই ইসলাম পর্দার ব্যবস্থা করেছে। মোদ্দাকথা, নারী যাতে তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপথে চালিত না হয় এবং পুরুষও যাতে নারীর কর্মক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে প্রবেশ করতে না পারে, তাই হচ্ছে পর্দার লক্ষ্য।

আপনারা আজ তথাকথিত প্রগতির মোহে পর্দার এ বিধানকে ধ্বংস করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। কিন্তু আপনারা যদি এ উদ্দেশ্যে অটল থাকতে চান, তাহলে এর পরে দুটি পথের একটি আপনাদের অবলম্বন করতে হবে। হয় ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থার সমাধি রচনা করে আপনাদের হিন্দু কিংবা খৃষ্টানদের ন্যায় নারীকে দাসী ও পদসেবিকা বানিয়ে রাখতে হবে। নতুবা দুনিয়ার সমস্ত মানব তৈরির কারখানা ধ্বংস হয়ে যাবে; যাতে জুতা কিংবা পিস্তল তৈরির কারখানা বৃদ্ধি পায়, তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে।

আমি আপনাদেরকে এ কথা দৃঢ়তার সাথে জানিয়ে দিতে চাই যে, ইসলামের প্রদত্ত জীবন বিধান ও সামাজিক শৃংখলা ব্যবস্থাকে চুরমার করে দিয়ে নারীর সামাজিক মর্যাদা এবং পারিবারিক ব্যবস্থাকে বিপর্যয়ের কবল থেকে বাচিঁয়ে রাখা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আপনারা প্রগতি বলতে যাই বুঝে থাকুন না কেন, কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে আপনাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন যে, আপনারা কী হারিয়ে কী পেতে চান?

প্রগতি একটি ব্যপক অর্থবোধক শব্দ। এর কোনো নির্দিষ্ট কিংবা সীমাবদ্ধ অর্থ নেই। মুসলিমরা এক কালে বঙ্গোপসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিশাল বিস্তৃত রাজ্যের শাসনকর্তা ছিল। সে যুগে ইতিহাস দর্শন ও জ্ঞান বিজ্ঞানে তারাই ছিল দুনিয়ার শিক্ষা গুরু। সভ্যতা ও কৃষ্টিতে দুনিয়ার কোনো জাতিই তাদের সমকক্ষ ছিল না। আপনাদের অভিধানে ইতিহাসের সেই গৌরবোজ্জল যুগকে প্রগতির যুগ বলা হয় কিনা জানি না। তবে সেই যুগকে যদি প্রগতির যুগ বলা যায় তাহলে আমি বলব, পর্দার পবিত্র বিধানকে পুরোপুরি বজায় রেখেই তখনকার মুসলিমরা এতটা উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল।

ইসলামের ইতিহাসে বড় বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিন্তানায়ক, আলেম ও দিগ্বিজয়ী বীরের নাম উজ্জল হয়ে রয়েছে। সেসব বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই তাদের মূর্খ জননীর ক্রোড়ে লালিত পালিত হন নি। শুধু তাই নয়, ইসলামী ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা বহু খ্যাতনামা মহিলার নামও দেখতে পাই, সে যুগে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে দুনিয়ায় অসাধারণ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের এ উন্নতি ও প্রগতির পথে পর্দা কখনই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় নি। সুতরাং আজ যদি আমরা তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রগতি অর্জন করতে চাই তাহলে পর্দা আমাদের চলার পথে বাধার সৃষ্টি করবে কেন?

পর্দাহীনতার পরিণতি

অবশ্য পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের বল্গাহীন জীবনধারাকেই যদি কেউ 'প্রগতি' বলে মনে করেন তাহলে তার সে প্রগতির পথে পর্দা নিঃসন্দেহে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। কেননা পর্দার বিধান মেনে চললে পাশ্চাত্য কায়দার প্রগতি অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু আপনারা জেনে রাখুন, এ তথাকথিত প্রগতির ফলেই পাশ্চাত্যবাসীদের নৈতিক ও পারিবারিক জীবন আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। সেখানে নারীকে তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্র থেকে টেনে এনে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে নারীও তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়ে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। এর ফলে-অফিস আদালত ও কল-কলখানার কাজে কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়েছে বটে। কিন্তু সেই সংগে সেখানকার পারিবারিক জীবন থেকেও শান্তি শৃংখলা বিদায় নিয়েছে। তার কারণ, যে সকল নারীকে অর্থোপার্জনের জন্যে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয় তারা কখনো পারিবারিক শৃংখলা বিধানের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে না আর তা সম্ভবও নয়।

এ জন্যেই আজ পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা পারিবারিক জীবনের চাইতে হোটেল, রেস্তোরা ও ক্লাবের জীবনেই বেশী অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। সেখানে বহু মানব সন্তান ক্লাব রেস্তোরাতেই জন্মগ্রহণ করে, আর ক্লাব-রেস্তোরাঁতেই জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। মাতা-পিতার স্নেহ মমতা তারা কোনোদিনও উপভোগ করতে পারে না। অপরদিকে দাম্পত্য অশান্তি, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং যৌনাচার সেখানে এরূপ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে যে, আজ সেখানকার মনীষীরাই তাদের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আতঁকে উঠছেন।

মোদ্দাকথা, পশ্চিমা সভ্যতা বাহ্যিক চাকচিক্যের পশ্চাতে মানুষের জীবনধারাকে এমনি এক পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছিয়েছে, যেখানে মানবতার ভবিষ্যত সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এরূপ বল্গাহীন ও উচ্ছৃংখল জীবন ধারাকে যদি কেউ প্রগতির পরিচায়ক বলে মনে করেন, তবে তিনি তা সানন্দেই গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু ইসলাম এরূপ অভিশপ্ত জীবনকে আদৌ সমর্থন করে না।

সমাপ্ত